ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607012

ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান: তাঁর প্রতিষ্ঠা-অর্জন ও ভাস্কর্য-বৈশিষ্ট্য

নাসিমা হক মিতু*

Abstract: Hamiduzzaman Khan is one of the established sculptors of Bangladesh. The modern sculptures of the west was the primary source of his inspiration in creating sculptures. In this paper, the effort has been to understand the tendencies of the modern sculptural practice in Bangladesh by examining the way Hamiduzzaman's idea of modern sculpture traversed and established itself over time. In adapting the modern art language contextually, the figurative forms got importance in this country. Hamiduzzaman tried to create a close relation between the non-figurative abstract sculpture and the people of this country. However, he could not ignore the interest of the people in figurative, narrative work. Time and again, he returned to figurative form. His sculptures travelled between figurative, figure-centric abstract and non-figurative abstract trends. Local historicity influenced his thoughts on sculpture and this thought process assimilated various conflicting positions and defined his journey through the creative avenue of sculpture.

মুখ্যশব্দ: হামিদুজ্জামান খান, ভাস্কর্য, আধুনিক, বিমূর্ত

বাংলাদেশের ভাস্কর্য চর্চায় অগ্রসরজনদের অন্যতম হামিদুজ্জামান খান (১৯৪৬–২০২৫)। একটি নগরে ভাস্কর্য স্থাপনের সকল সম্ভাবনাকে তিনি আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রদর্শনী, কমিশন কাজের পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁর ভাস্কর্যকে প্রদর্শন করে নিজ ভাস্কর্য চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে গেছেন। এই প্রবন্ধে হামিদুজ্জামানের আধুনিক ভাস্কর্য সম্পর্কিত ভাবনা এ দেশের প্রেক্ষাপটে কীভাবে পথ পরিক্রম করে ও প্রতিষ্ঠা পায়, তা বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক ভাস্কর্য চর্চার গতি-প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

হামিদুজ্জামান খান ভাস্কর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে করা *একাত্তরের স্মরণে* (*Remembrance ’71*) ভাস্কর্য সিরিজের কাজগুলোর মধ্য দিয়ে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজগুলি তিনি করা শুরু করেছিলেন ভারতের বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যায়নকালে (১৯৭৪–১৯৭৬)। এই সময়টিকে হামিদুজ্জামানের ভাস্কর হিসেবে নিজস্ব সৃজনশীল ক্রমবিকাশের উন্মেষকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই পর্যায়ে তাঁর কাজে 'মুক্তিযুদ্ধ' বিষয় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রধান ও অন্যতম কারণ ছিল তাঁর নিজের সদ্য মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। শিল্প সমালোচক নজরুল ইসলাম আরেকটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁর মনে হয়েছে, '... the idea must have got into his head when he was assisting his teacher Abdur Razzaque in executing his first monumental sculpture of a *Muktijoddha*, *Jagroto Chowrongi* in Dhaka in 1972.' (Nazrul, 2005, p. 10)। ভাস্কর আবদুর রাজ্জাকের করা *মুক্তিযোদ্ধা* ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম গণপ্রাঙ্গণ ভাস্কর্য। পরের বছর ১৯৭৩ সালেই আবদুল্লাহ খালিদ *অপরাজেয় বাংলা* গড়ার কমিশন পান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের সকল শাখার সৃজনশীল ব্যক্তির চালিকাশক্তি হয়ে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। তবে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে শুধু অনুপ্রেরণা নয়; এ দেশে যখন ভাস্কর্যবিষয়ক ধারণা ও চর্চা সীমিত জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এমন অবস্থায় এ দেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গণপ্রাঙ্গণ ভাস্কর্য গড়ার চাহিদার মধ্য দিয়ে ভাস্কর্য পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়[১]। ভাস্কর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সম্ভাবনা নিয়ে এক ধরনের সচেতনতার জন্ম দেয়, যা হামিদুজ্জামানকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। অন্যদিকে, আমরা যদি বাংলাদেশের প্রারম্ভিক সময়ের আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রবণতা লক্ষ করি তাহলে দেখব যে, চিত্রীগণ তাঁদের প্রত্যক্ষীকরণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে নিরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন, যেখানে মানবতাবোধ অভিব্যক্তির অন্যতম নির্ণায়ক। এটি এ দেশের আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রারম্ভিক সময়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ দেশের চারুকলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীদের অন্যতম– জয়নুল, সফিউদ্দিন, কামরুল যখন অবিভক্ত ভারতে কলকাতার বিশাল শিল্প জগতে নিজেদের শিল্পী হিসেবে বিকশিত করছিলেন, তখন তাঁদের কাজে সে সময়ের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারার (পাশ্চাত্যের একাডেমিক ধারা ও নব্য-বঙ্গীয় ধারা) বাইরে ভিন্ন প্রবণতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় (শোভন, বা. ১৪০২, পৃ. ৯৪)। শৈলীগত নিরীক্ষায় এঁদের প্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু এঁদের কাজে চেতনাগত ও বিষয়গত একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এর সূত্রপাত ঘটে কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে। এঁরা যখন কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রবেশ করেছেন তার আগেই স্কুলের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ মুকুল দে-র হাত ধরে স্কুলে চেতনাগত একটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। শিল্পের বিষয় ভাবনায় একটা পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে মুকুল দে-র এচিংয়ে, রমেন্দ্রনাথের এচিং ও তেল রংয়ের কাজে কাব্যপুরাণ-ইতিহাসাশ্রিত কাল্পনিক বিষয়ের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ জীবন তাঁদের কাজের বিষয় হয়ে ওঠে। তাঁদের ছবিতে বার বার গ্রামবাংলার প্রত্যক্ষ জগতের দৃশ্য ফিরে ফিরে আসে। এ সময়ে মুকুল দে ও রমেন্দ্রনাথের প্রণোদনায় শিক্ষার্থীদের কাজেও প্রতিদিনের যাপিত জীবন চিত্রের বিষয় হয় (Jogesh, 1966, p. 45)। তাছাড়াও এই

সময়কার বৈশ্বিক পটভূমি লক্ষ করলে দেখা যায়, এটি সমাজতন্ত্রের এক শক্তিময় সময়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তখন ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপরীত এক সমান্তরাল শক্তি হয়ে উঠছে। সমাজতন্ত্র সকল প্রগতিশীল মানুষকে উজ্জীবিত করছে। এর প্রতিফলন পড়েছিল জয়নুল, সফিউদ্দিন, কামরুলের শিল্প-চেতনায়। তাঁদের কাজে বিষয় হয়ে উঠেছিল প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন ও জীবন-সংগ্রাম। এই প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীদের হাত ধরে সাধারণ জীবনের প্রতি এক ধরনের পক্ষপাত দিয়ে এ দেশের আধুনিক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আর প্রাথমিকভাবে সাধারণ জীবন ও প্রকৃতির প্রতি প্রগাঢ় ও সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা– এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে সাতচল্লিশ পরবর্তী পূর্ববাংলার শিল্পকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। আমিনুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন, এ দেশের প্রকৃতি ও জনজীবন পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন কীভাবে পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। জয়নুল আবেদিন তাঁদের উৎসাহিত করেছেন শ্রমজীবী মানুষ ও কারিগরদের জীবনের কাছাকাছি গিয়ে তাঁদের নিয়ে ছবি আঁকতে। আমিনুল ইসলাম বলেন– 'শিল্পী হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব দরিদ্র শ্রমজীবী-জীবনের ছবি আঁকার প্রবর্তন, ঢাকা আর্ট স্কুলের পরবর্তী প্রায় সমস্ত ছাত্রেরই সামাজিক ভাবনায় নিশ্চিত প্রভাব ফেলেছে বহুদিন' (আমিনুল, ২০০৩, পৃ. ৩৫)। হামিদুজ্জামান নিজে চিত্রকলার শিক্ষার্থী ছিলেন; তিনিও এ দেশের মানুষের সাধারণ জীবন ও প্রকৃতির প্রতি সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করেছেন এবং প্রত্যক্ষীকরণের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পের পাঠ গ্রহণ করেছেন। হামিদুজ্জামানের সৃজনশীল ভাস্কর্য গড়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর নিজের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা 'বিষয়' হয়ে উঠবে এটা খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা ছিল। তবে তিনি এমন এক বিষয়কে নির্বাচন করলেন, যা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি নয়; মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার স্মৃতি তখন এ দেশের প্রতিটি মানুষের মনে ক্ষতের মতো বিঁধে ছিল। তিনি এই ভাস্কর্যগুলিতে প্রাথমিকভাবে তাঁর নিজের এবং এ দেশের মানুষের অনুভবকে ধরতে পেরেছিলেন এবং দৃশ্যগত অভিজ্ঞতাকে ত্রিমাত্রিক ভাষায় রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজগুলির রচনা একইসাথে বর্ণনামূলক বা ঘটে যাওয়া ঘটনার রূপান্তরিত রূপ; যা শুধু সত্যকে উপস্থাপন করেছে এমন নয়, ঘটনার সংবেদনশীলতাকেও ধারণ করেছে। এর দৃশ্যরূপ ও অনুভবের সাথে এ দেশের মানুষ সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্রসমূহ হামিদুজ্জামানের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত ছিল। শিল্প সমালোচক নজরুল ইসলাম মনে করেন যে, '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা যেমন জয়নুল আবেদিনকে বৃহত্তর পরিসরে শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান করে তুলেছিল, তেমনি হামিদুজ্জামানের *একাত্তরের স্মরণে* ভাস্কর্যগুলি তাঁকে এ দেশের একজন অন্যতম ভাস্কর হিসেবে তাঁর আসনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল (Nazrul, 2005, p.7)। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রথম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে তাঁর এই কাজের উপস্থাপনা ছিল (বাংলাদেশে এই সিরিজের কাজের প্রথম প্রদর্শন এবং শ্রেষ্ঠ ভাস্করের পুরস্কার লাভ) অনেকটা এ দেশের মানুষের অন্তস্থলের বেদনাকে পুনর্ব্যক্ত করার মতো; দর্শক পুনরায় যেন '৭১-এর ভয়াবহ স্মৃতিতে ফিরে যান (Nazrul, 2005, p. 9)। এই প্রদর্শনীর দুটি

কাজের একটি *একাত্তরের স্মরণে– ঝুলন্ত মানুষ* (১৯৭৪, ব্রোঞ্জ, ৬০ x ৯০ x ১০ সে.মি.) (চিত্র ১); দেয়ালে ঝোলানো পাঁচটি মানবাবয়ব, কোনোটির মাথা উপরে, কোনোটির নিচে। অবয়বগুলির ভঙ্গি অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিষ্টের আদলের মতো; এই সদৃশকরণ দর্শককে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মত্যাগকে বিশেষভাবে দেখতে নিয়োজিত করে এবং ঘটনা প্রতীকে পরিণত হয়ে উঠতে চায়। অপর কাজটি *একাত্তরের স্মরণে– দরজা* (১৯৭৪, ব্রোঞ্জ, ৩০ x ২০ x ৭ সে.মি., ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রথম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে এ কাজটি পুরস্কৃত হয়) (চিত্র ২); ভাঙা দরজার সামনে পড়ে আছে মৃতদেহ, পাশে দাঁড়ান খাদ্যান্বেষী কুকুর। রচনার প্রধান রূপ একটি ভাঙাচোরা দরজার দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামো। এই কাঠামো গড়ে উঠেছে প্রতিরোধের অস্ত্র রাইফেলের রূপের সাথে সাদৃশ্য রেখে। মানুষ, পশু অবয়ব, প্রতিরোধের অস্ত্র (রাইফেল), দরজার কাঠামো একসাথে মিলেমিশে একটি একক রূপ ধারণ করেছে। অভিব্যক্তিতে একইসাথে বেদনার ও দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটেছে, শত বাধার মুখে টিকে থাকার ও প্রতিরোধ করার একটা অভিপ্রায় আছে। দরজাটিকে দেশমাতৃকার প্রতীকও বলা যেতে পারে, সন্তানের আত্মত্যাগকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার, দরজাটির গড়ন আমাদের যৌথ চেতনে আর্চ বা জ্যোতির্বলয় বা প্রভামণ্ডল সম্পর্কিত যে ধারণা তার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং ঘটনার মহত্ত্বকে ব্যক্ত করে। একটি বৃহৎ ঘটনা ও গভীর বোধের প্রকাশ ঘটেছে সামান্য ও সরল ভঙ্গিমায় যা কাজটিকে মনুমেন্টাল[২] বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এই সিরিজের আরেকটি ভাস্কর্য *একাত্তরের স্মরণে- রিকশা* (১৯৭৪–১৯৭৫, ২৫x১৮x১০ সে.মি.) (চিত্র ৩); পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত রিকশাওয়ালা রিকশার গায়ে পড়ে আছে। এটি একাত্তরের পুরো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকার রাস্তায় সবার দেখা অতিপরিচিত একটি দৃশ্য। একইরকম অভিজ্ঞতা থেকে তিনি *ঠেলাগাড়ি* শিরোনামে দুইটি কাজ করেছেন (প্রথমটি নির্মাণের সময় ১৯৭৫, এর কর্মপদ্ধতি *রিকশার* অনুরূপ, ধাতু ঢালাই পদ্ধতিতে; দ্বিতীয়টি ১৯৭৬ সালে, ধাতুর পাত ও রড ঝালাই করে গড়া)। তবে শুধু ঘটনার বর্ণনা নয়, ঘটনা সম্পর্কিত উপলব্ধির অভিব্যক্তিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ভাস্কর্যগুলির অন্যতম প্রধান গুণ। উপলব্ধির সমান্তরাল করে এই সকল ভাস্কর্যের উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি, বিশেষ করে ধাতু ঢালাই ও ওয়েল্ডিংয়ের গুণাগুণকে সংবেদনশীলভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা এবং মণ্ডন সম্পাদনায় মোমের নমনীয় গলিত চরিত্রকে ধারণ করে হাত ও টুলসের অভিব্যক্তিপূর্ণ ব্যবহার ভাস্কর্যগুলির প্রাণের মূল উৎস। এখানে মাধ্যম ও কর্মপদ্ধতি অভিব্যক্তির সমার্থক হয়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে উপকরণের সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য ধরে গড়ন নিয়ে নিরীক্ষায় অন্তর্গত হওয়া হামিদুজ্জামানের কাজের একটি অন্যতম প্রবণতা হিসেবে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এই পর্যায়ে তিনি উপকরণের বৈশিষ্ট্য এবং গড়ন নিয়ে নিরীক্ষায় অগ্রসর হলেও বিষয়ের বর্ণনাধর্মী উপস্থাপনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেননি।

প্রাথমিকভাবে, বিষয় মুক্তিযুদ্ধ আর বিষয়ের অভিব্যক্তিপূর্ণ অবয়বধর্মী গড়ন, যার সাথে দর্শক সহজেই সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলেন– এটি হামিদুজ্জামানকে এ দেশের একজন প্রধান ভাস্কর

হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথকে প্রসারিত করেছিল। তাছাড়াও এই ভাস্কর্যগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্যের যে দিকটি লক্ষ করা যায় তা হলো– নিজ প্রাসঙ্গিকতায় পশ্চিমের আধুনিক শিল্প অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তিকরণ। পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেকেই পশ্চিমে যান। পশ্চিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে নানা চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। পঞ্চাশের দশকে জয়নুলের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে আরো বেশি দেশমুখী, ঐতিহ্যমুখী, লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিমুখী করে। যখন তাঁর ছাত্ররা অনেকেই পশ্চিমের অভিজ্ঞতায় আধুনিক শিল্পের নানা রীতি নিয়ে চর্চা শুরু করেছেন। জয়নুলের মনে হয়েছে– '…they could not speak to the heart of his country men, because the feelings of the people had not been educated through all the stages that have led to modern European styles. He wanted, above all, to establish rapport with the people…' (Amjad, 1965, p. 99)। তিনি তাঁর শিল্পকে এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন এবং তাঁর বিষয়ভাবনা ও চিত্রভাষা শেষ পর্যন্ত দৃশ্যমান জীবন জগতের অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যায় না; যার সাথে সাধারণ দর্শক সহজেই নিজ অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করতে পারে। জয়নুল এই জীবন-সংলগ্নতার প্রসঙ্গ ধরে এ দেশের আধুনিক শিল্প চর্চার সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে *একাত্তরের স্মরণে* তারই একটা উদাহরণ। তবে পঞ্চাশের দশকে চিত্রকলায় জয়নুল, কামরুল এবং ভাস্কর্যে নভেরা তাঁদের নিরীক্ষায় ঐতিহ্য বিষয়ক ধারণা থেকে যে লোকায়ত শিল্পাঙ্গিকের সংশ্লেষণ ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন (জয়নুল ও নভেরার কাজে লোকশিল্পের পুতুলের গড়ন ও কামরুলের কাজে পটচিত্রের বৈশিষ্ট্য), সে পথে হামিদুজ্জামান কখনও হাঁটেননি। পূর্ব-বাংলার মুসলমান শিল্পীদের এ দেশের পরম্পরা শিল্পের সাথে যোগাযোগ সহজাত ছিল না[৩]; এই প্রয়াস ছিল সচেতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক। কিন্তু, এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের নানা বিষয়কে ধারণ করে নিরীক্ষায় অন্তর্গত হওয়া বাংলার মুসলমান পটভূমি থেকে আসা শিল্পীদের ক্ষেত্রে ততটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল (জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দিন, সুলতানসহ দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখের চর্চায় প্রাথমিক পর্যায়ে এবং অনেকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তা প্রত্যক্ষ করা যায়)। একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বকল্পিত জাতিরাষ্ট্রে আধুনিক শিল্পের অভিযোজনে আত্ম-অনুসন্ধানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; এ ক্ষেত্রে এ দেশের শিল্পের আলোচনায় নিজ প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে কাজের 'বিষয়ভাবনা' বিশেষ গুরুত্ব পায়। আর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুধু এ দেশের জন্মের ইতিহাস নয়; মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সংগ্রামী, আত্মত্যাগের, কষ্টের ও গৌরবের একটি ঘটনা। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিল্পের চর্চায় মুক্তিযুদ্ধ 'বিষয়' হয়ে উঠবে এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। শুধু চারুশিল্পে নয়, এ দেশের সাহিত্যে, চলচিত্রে মুক্তিযুদ্ধ বার বার ঘুরেফিরে জায়গা করে নিয়েছে। এই সকল বিবেচনা থেকে হামিদুজ্জামানের *একাত্তরের স্মরণে* ভীষণরকম প্রাসঙ্গিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছিল। তার সাথে যুক্ত হয়েছে

ভাস্কর্যের উপকরণ ও কর্মপদ্ধতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা এবং দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত হয়েও সাদৃশ্যমূলক গড়নের চেয়ে প্রকাশভঙ্গি গুরুত্ব পায়; যেখানে আঙ্গিক ও বিষয় পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিশিল্পীর অভিব্যক্তির প্রকাশ মুখ্য হয়ে ওঠে। সঙ্গতভাবেই এই ভাস্কর্যগুলি এ দেশের আধুনিক ভাস্কর্যের একটি দৃষ্টান্ত।

পরবর্তী সময়ে বিষয় হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধ' হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্য চর্চায় বার বার ফিরে ফিরে এসেছে, নানা রীতিতে। যার সিংহভাগ কমিশন কাজ; অধিকাংশই এ দেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মনুমেন্ট হিসেবে ভাস্কর্য গড়ার প্রবণতাকে ধারণ করেছে। তবে, আশির দশক পর্যন্ত তিনি মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নানাভাবে তাঁর নিজস্ব ভাস্কর্য নিরীক্ষা অব্যাহত রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি থেকে তিনি যেমন মুখাবয়ব ভাস্কর্য গড়েছেন (ঝালাই, তক্ষণ, ঢালাই প্রক্রিয়ায়); তেমনি আবার মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে ক্ষণস্থায়ী, সংগ্রহ করা নানা বস্তুর সমন্বয়ে বিন্যস্ত অস্থায়ী শিল্প প্রদর্শন করেছেন। সে সময়ে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের চর্চায় এই রকম ক্ষণস্থায়ী উপকরণ ব্যবহার করে অস্থায়ী উপস্থাপনের ধরনটি একবারে নতুন। এই ধারায় ১৯৮০ সালে করা *আর নয়* (পরে নাম দেন *দরজা*) (চিত্র ৪) কাজটি প্রমাণাকারে গড়া; একটি শাটার ডোরের (সংগৃহীত) নিচে মেঝেতে পড়ে আছে মৃত দেহ। পা কাঠ দিয়ে তৈরি, কাপড়ের প্যান্ট শার্ট ব্যবহার করে অবশিষ্ট মানবাবয়বের গড়ন সম্পূর্ণ করেছেন। একই রীতিতে ১৯৮৪ সালের ঘূর্ণিঝড় নিয়ে নির্মাণ করেছেন *উড়ির চরে* (১৯৮৬, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে) (চিত্র ৫) এবং একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে তিনি আরো কিছু কাজ প্রদর্শন করেন (তার মধ্যে ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে করা *একাত্তরের স্মরণে* শিরোনামের দুটি কাজ)। ১৯৮২ সালে ঢাকায় তাঁর প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে এইরকম অস্থায়ী কাজ তিনি প্রদর্শন করেছিলেন (লেখকের সাথে শিল্পীর কথোপকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)। তাঁর এই ধরনের কাজের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ভারতের বরোদায় অবস্থানকালে। বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ২৫ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে মুম্বাই (তৎকালীন বোম্বে) শহরে একটি প্রদর্শনী (১৯৭৬) হয়। এই প্রদর্শনীতে তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৩টি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। এই ভাস্কর্যের মধ্যে ২টি ব্রোঞ্জ ঢালাই (*রিকশা* ও *ঠেলাগাড়ি*) ও ১টি মিশ্র মাধ্যমে করা ছিল। এই মিশ্র মাধ্যমের (প্লাস্টার, কাপড়, কাগজ ইত্যাদি) ভাস্কর্যটি একটি শায়িত মানব দেহ, যাকে তিনি মেঝেতে কাপড়ের উপর স্থাপন করেছিলেন (লেখকের কাছে শিল্পীর দেয়া তথ্য, ১৬ জুলাই, ২০১৯)। জানা যায়, তাঁর এই বেদিবিহীন ভাস্কর্যের উপস্থাপনা সে সময়ে ভারতে বেশ আলোচিত হয়েছিল। এই কাজ দেখে ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন নিজ উদ্যোগে তাঁর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন (শাওন, ২০১৮, পৃ. ১৩২)। এই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে শিল্পীকে উৎসাহিত করে, যা পরবর্তী সময়ে তাঁকে এই ধরনের অস্থায়ী শিল্প নির্মাণে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁর এই অস্থায়ী কাজগুলি ধারণা ও উপলব্ধির দিক থেকে *একাত্তরের স্মরণে* কাজগুলির মতো। এর অবয়ব বাস্তবানুগ রীতিতে গড়া নয়, কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি আরও অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও বর্ণনাধর্মী; একটি দৃশ্য

প্রতিস্থাপনের মতো। নানা ক্ষণস্থায়ী ও ব্যবহারিক বস্তুর সরাসরি ব্যবহার ও অস্থায়ী প্রদর্শন থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে করার সুযোগ আছে যে, এই কাজগুলি স্থাপনা শিল্পের[৪] অনুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত। কিন্তু সে সময়ে হামিদুজ্জামানের স্থাপনা শিল্প দেখার অভিজ্ঞতা বা পাঠ ছিল না। তিনি বলেন, মূলত দৃশ্য বা ঘটনার যথাযথ রূপ নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর কাজ এমন বৈশিষ্ট্যে উপনীত হয় (লেখকের সাথে শিল্পীর কথোপকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)। কাজগুলি প্রধানত সংবেদনশীল প্রত্যক্ষীকরণের অভিজ্ঞতাকে এবং অসহায়, নির্মম বেদনার অনুভবকে ব্যক্ত করেছে। তবে এই ধরনের অস্থায়ী বর্ণনাধর্মী উপস্থাপন পরবর্তী সময়ে হামিদের কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে অগ্রসর হতে দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে নির্বস্তুক বিমূর্ত রীতির[৫] চর্চা তাঁর বিশেষ আগ্রহের জায়গা হয়ে উঠতে দেখা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, পর্যবেক্ষণনির্ভর বাস্তুবানুগ[৬] ভাস্কর্য চর্চায় হামিদুজ্জামান কখনো খুব আগ্রহী ছিলেন, এমনটি বলা যাবে না। ভাস্কর্য চর্চার একবারে শুরুতে মডেলকে অনুসরণ করে কিছু প্রতিকৃতিমূলক ভাস্কর্য তিনি অনুশীলন করেছিলেন মাত্র। তাঁর ভাস্কর্য নিরীক্ষা শুরু হয় অবয়বকেন্দ্রিক বিমূর্ত রূপ দিয়ে; এটি হামিদের কাজের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দেহাবয়ব প্রসূত বিমূর্তায়নকে তিনি কখনোই সম্পূর্ণভাবে বাদ দেননি। অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য এবং কমিশন ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তিনি বার বার অবয়বের কাছে ফিরে গেছেন। মোটামুটিভাবে আশির দশক পর্যন্ত তাঁর কাজের বিমূর্তায়ন দেহাবয়ব থেকে উৎসারিত। দেখা যাচ্ছে, নব্বইয়ের দশক থেকে ধাতু ঝালাইকৃত নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপ তাঁর কাজে কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। ভাস্কর্য নিরীক্ষার শুরু থেকেই জোড়া দিয়ে কাজ করায় হামিদুজ্জামান অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তিনি তাঁর বরোদা পর্বের ধাতু ঢালাই কাজগুলির (*একাত্তরের স্মরণে*) মণ্ডণ সম্পাদন করেছেন সরাসরি মোমের স্লাব ব্যবহার করে; স্লাব কেটে কখনো সোজা, কখনো বাঁকা, কখনো দুমড়ে-মুচড়ে জোড়া দিয়েছেন। তাছাড়া লক্ষণীয় যে, সত্তরের দশকে আবদুর রাজ্জাকের পাশাপাশি হামিদুজ্জামান নিজেও (কম্পোজিশন, ১৯৭৭, চিত্র ৬) এবং আরও কেউ কেউ (এর মধ্যে অনেকের ভাস্কর্য চর্চা স্থায়ী হয়নি) ফাউন্ড অবজেক্ট দিয়ে ধাতু ঝালাই করে সম্পূর্ণ বিমূর্ত ভাস্কর্যের চর্চা করেছেন। এভাবে দেখলে প্রাথমিকভাবে হামিদুজ্জামানের কনস্ট্রাকশন পদ্ধতি বা ধাতু ঝালাই বা সম্পূর্ণ বিমূর্ত রূপ কোনোটাই নতুন কোনো ঘটনা ছিল না। তবে, বাংলাদেশে বহিরাঙ্গণে ও স্থাপত্য সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য চর্চায় কনস্ট্রাকশন পদ্ধতির ব্যাপকতা ও এ দেশে সাধারণ মানুষের কাছে নির্বস্তুক বিমূর্ত রীতির ভাস্কর্যকে পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে হামিদুজ্জামান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

উল্লেখ্য যে, হামিদুজ্জামান চিত্রকলা বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি জলরং চিত্রে পারদর্শিতার জন্য শিল্পমহলে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর ভাস্কর্য বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল পশ্চিমে সরাসরি ভাস্কর্য দেখার অভিজ্ঞতা থেকে। ফাইন আর্টে ডিগ্রি সমাপ্ত (বর্তমান অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩–১৯৬৭) করে তিনি চিকিৎসার প্রয়োজনে ১৯৬৯ সালে ইংল্যান্ডে যান। তাঁর এই প্রথম পশ্চিমে ভাস্কর্য দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর ভাস্কর হয়ে

ওঠার প্রারম্ভিক একটি বিষয়। তিনি ছয় মাস পর দেশে ফিরে এসে নিয়মিত ভাস্কর্য চর্চা শুরু করেন। এই যাত্রায় তিনি ইংল্যান্ডে যান মালবাহী জাহাজে করে, দেড় মাস ধরে, নানা দেশ দেখতে দেখতে। যাওয়ার পথে তিনি আফ্রিকার বন্দর শহর কেপটাউন ও ডাকারে প্রথমবারের মতো আদিবাসী কাঠখোদাই ভাস্কর্য দেখেন। এডিনবরায় অপারেশনের পর তিনি চার মাস লন্ডনে ছিলেন; ফেরার পথে প্যারিস, ইতালি হয়ে দেশে ফেরেন। লন্ডন, প্যারিস, ইতালির প্রধান প্রধান মিউজিয়ামগুলি দেখেন, প্যারিসে জিয়াকোমেত্তির একটি প্রদর্শনী দেখার সুযোগও তাঁর হয়। এই শহরগুলোর বহিরঙ্গণ ভাস্কর্যগুলি তাঁর মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁর কাছে ভাস্কর্যকে শিল্প মাধ্যম হিসেবে অনেক শক্তিশালী মনে হয়। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সাথে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপনে ভাস্কর্যের ভূমিকা তাঁকে উজ্জীবিত করে (Kaiser, 2018, pp. 80−81)। তাঁর ভাষ্যানুসারে, এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ নতুন পথে পরিচালিত করে। এর আগে ভাস্কর্য তাঁর কাছে বিশেষ হয়ে ধরা দেয়নি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি মনে করেছেন, এ দেশে ধারাবাহিক ভাস্কর্য চর্চার অনুপস্থিতি। তিনি এ দেশের ধ্রুপদী ভাস্কর্য প্রথম দেখেছেন জাদুঘরে। তিনি যখন চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন তখন সবেমাত্র ভাস্কর্য বিভাগ খোলা হয়েছে, ডিগ্রি কোর্স তখনও চালু হয়নি; আবদুর রাজ্জাক ভাস্কর্য চর্চা শুরু করেছেন মাত্র। সে সময়ে আর্ট স্কুলে চিত্রকলারই আধিপত্য ছিল (2018, p. 81)। হামিদুজ্জামান বলেছেন−

> I needed the exposure I had to a large number of sculptures of varied styles to make me feel that sculpture was what I wanted to devote myself to. Of course, later on I became well-acquainted with the subcontinental tradition in sculpture.’ (Kaiser, 2018, p. 81).

এটি সত্য যে, হামিদুজ্জামানের পশ্চিমের অভিজ্ঞতা তাঁকে ভাস্কর্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। আর এখন পর্যন্ত তাঁর ভাস্কর্য চর্চায় জাতীয় চেতনা বা আত্মপরিচয়ের সংকট বা ঐতিহ্য বিষয়ক ধারণা নিয়ে কোনো জটিলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। বরং তাঁর *একাত্তরের স্মরণে* কাজগুলোর বিষয়গত প্রেরণায় জাতীয় চেতনার চেয়ে মানবতাবোধ অনেক বেশি সোচ্চার ছিল; মানবীয় দায়বদ্ধতা তাঁকে উসকে দিয়েছিল এই সকল রচনায়। জয়নুলের হাত ধরে যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে জারি ছিল এটি তারই ফল। একইরকমভাবে জয়নুলের অনুরণন অনুভব করা যায় তাঁর একাত্তরের স্মরণে ও স্থাপনাধর্মী কাজগুলিতে; বিশেষ করে ‘বিষয়’ নির্বাচন (বিপর্যয় ও অসহায় জীবনের উপস্থাপনা) ও প্রত্যক্ষীকরণের সংবেদনশীলতাকে ধারণ এবং বাস্তবধর্মী উপস্থাপনার ভেতর দিয়েই বাস্তবানুগ বৈশিষ্ট্যের গণ্ডিকে অতিক্রম (জয়নুলের চিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য) করে যাওয়ার প্রবণতার ক্ষেত্রে। আমরা যদি তাঁর বরোদা পর্বকে ভাস্কর্য নিরীক্ষার প্রারম্ভিক সময় ধরি, তাহলে দেখব যে, একদিকে প্রত্যক্ষীকরণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে নিরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া, যেখানে শিক্ষক জয়নুল তাঁর

অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছিলেন; অন্যদিকে ভারতের বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার শিক্ষার পরিবেশ তাঁকে শুধু ভাস্কর্যের মাধ্যম, উপকরণ ও উপাদান আয়ত্ত করায় সুদক্ষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেনি, বরং তাঁকে নানা আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল[৭]। সেই সাথে তাঁর ইউরোপে দেখা ভাস্কর্যের অভিজ্ঞতাকে তিনি নিজ নিরীক্ষায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্য বিষয়ে আগ্রহের সূচনাকাল থেকে এ দেশের একজন অন্যতম প্রধান ভাস্কর হয়ে ওঠার যাত্রাটি অতি দ্রুতই অগ্রসর হয়েছিল। তিনি ১৯৬৯ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে এসে ঢাকায় আবদুর রাজ্জাকের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক) তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ভাস্কর্য চর্চা শুরু করেন। ইতোমধ্যে ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষক আনোয়ার জাহান চাকুরি ছেড়ে দিলে জয়নুল আবেদিনের আগ্রহে ১৯৭০ সালে সেই পদে হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ সালে তিনি ভারতীয় বৃত্তি লাভ করে বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাস্কর্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন[৮]। ভারতের বরোদা থেকে ফিরে আসার পরপরই ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে তিনি শ্রেষ্ঠ ভাস্করের পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলে তাই নয়, তাঁকে এ দেশের একজন প্রতিভাবান ভাস্কর হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। এর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কমিশন কাজ পাওয়ার সুযোগ ঘটে। তাঁর এই কমিশন কাজের পথ উন্মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভাস্কর্য রচনা বা পুরস্কার প্রাপ্তিই একমাত্র কারণ ছিল না। আরেকটি কারণ– প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য পৃষ্ঠপোষকরা ঢাকার ভাস্কর্য বিভাগের দ্বারস্থ হতেন। এ ক্ষেত্রে আবদুর রাজ্জাক নিজে হামিদুজ্জামানকে উপযুক্ত মনে করতেন, এবং তাঁকে এগিয়ে দিতেন (গ্যালারি ডটস্ আয়োজিত শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী এ বিষয়ে আলোকপাত করেন, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬। লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন)। এর একটি কারণ, সে সময়ে যে কয়েকজন নিয়মিত ভাস্কর্য চর্চা করছিলেন তাঁদের মধ্যে হামিদুজ্জামান-ই একমাত্র, যাঁর ভাস্কর্য বিষয়ে বিদেশে অর্জিত একটা আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল, যা হামিদের উপর আস্থা তৈরি করেছিল। এটি প্রাথমিকভাবে তাঁর কমিশন পাওয়ার পথকে সহজ করে দিয়েছিল ও তাঁর প্রতিষ্ঠার পথকে প্রসারিত করেছিল। তিনি প্রথম ১৯৮০ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবভনের (রাষ্ট্রপতি ভবন) সামনে তাঁর অন্যতম শোভাবর্ধক বহিরঙ্গণ ফোয়ারা ভাস্কর্য *পাখি পরিবার* (ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট ১৯৮০, ভাস্কর্যের উচ্চতা ১৯ ফুট) (চিত্র ৮) গড়ার কমিশন পান। এই কমিশন কাজটি তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সন্ধিক্ষণ। ইউরোপে দেখা প্রাঙ্গণ ভাস্কর্য তাঁর মধ্যে যে উদ্দীপনা ও ভাস্কর্য গড়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিল এই কমিশনটি তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণের সুযোগ করে দিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর ইউরোপে দেখা ফোয়ারা ভাস্কর্যের অভিজ্ঞতা যেমন প্রেরণা হয়ে কাজ করেছিল; তেমনি আবদুর রাজ্জাকের

মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও ভারতে তাঁর শিক্ষক শঙ্খ চৌধুরী ও রাঘব কানারিয়ার কিছু বৃহদাকার ভাস্কর্য নির্মাণে তাঁদের সহকারী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে এরকম বড় আকারের ভাস্কর্য নির্মাণে সাহস যুগিয়েছিল (লেখকের সাথে শিল্পীর কথোপকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)। এখানে তিনি ফোয়ারা ভাস্কর্যের বিষয় হিসেবে বেছে নেন পানির সাথে সম্পর্কিত লম্বা লম্বা পা ও দীর্ঘ ঠোঁটওয়ালা সারস বা বক পাখির আদলকে, যে আদলের সাথে সবাই পরিচিত। জোড়া দিয়ে কাজ করায় হামিদ স্বচ্ছন্দ; তিনি কাজটি গড়লেন কনস্ট্রাকশন পদ্ধতিতে। বহিরঙ্গণের জন্য বেছে নিলেন পিতলের পাত ও পাইপ। পাত ও পাইপ ঝালাই করে রেখা ও তল, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক স্পেসের সমন্বয়ে রচনাটি সম্পন্ন করলেন। রচনাটি ঝর্ণার ঊর্ধ্বমুখী গতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। লম্বা লম্বা রেখা এর রূপকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বৃত্তাকার স্পেসের মাঝে তিনটি পাখি অবয়বের সমন্বয় একটি পিরামিড আকৃতির স্পেসকে ধারণ করেছে। নিচের অংশে চিকন লম্বা লম্বা পা, মাঝের অংশে ডানাগুলো উড়ে যাওয়া বা বসার পূর্ব মূহুর্তের ভঙ্গিমায় প্রসারিত, আর উপরের অংশে দীর্ঘ ঊর্ধ্বমুখী গ্রীবা ও ঠোঁট ক্রমশ সরু হয়ে একটি বিন্দুতে মিলে যেতে চাইছে– যা কাজটিকে টানটান, ছান্দিক গতিময়তা দিয়েছে। ভাস্কর্যটি যেমন, '... to be in harmony with the architectural concept.' (Shah Alam, 1981, p. 3) তেমনি, 'the sculptor had a challenge to create a dynamic sensation in his static object to merge as one with the moving, falling water of the fountain.' (Shah Alam, 1981, p. 3)। এই ভাস্কর্য রচনায় বিষয়গত ভাবনা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, ততটাই স্পেস সম্পর্কিত চিন্তা ও গতিময় জ্যামিতিক আকার নিরীক্ষার মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কাজটি প্রথম থেকেই হামিদের বিমূর্ত রীতির প্রতি আগ্রহের জায়গাটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এটি হামিদের প্রথম বহিরঙ্গণ ভাস্কর্য। তখন তিনি এ দেশের একজন সম্ভাবনাময় ভাস্কর হিসেবে পরিচিত মাত্র, প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর নন। কিন্তু এই কাজের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে এর রূপ ও মাধ্যম বিষয়ক ভাবনায় তিনি তাঁর নিজ চিন্তা ও নিরীক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন– যা আজও এ দেশের কমিশন কাজে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। হামিদুজ্জামান বলেন, প্রথমাবস্থায় বেশিরভাগ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ কাজটির জ্যামিতিক গুণের যথোচিত বিচার করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে বাস্তবসম্মত পাখির আদল দেখার একটা চাহিদা ছিল। শেষ পর্যন্ত সে সময়ের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান স্থপতি শাহ আলম জহিরুদ্দীনের জোরালো সমর্থন ও বিদেশী অতিথিদের প্রশংসা পৃষ্ঠপোষকদের কাছে কাজটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে (লেখকের সাথে শিল্পীর কথপোকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই মনে আসে যে, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা অবয়বধর্মী ভাস্কর্য রচনায় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; বরং এমন ধারণা দৃঢ় হয় যে, প্রতিনিধিত্বমূলক বাস্তবসম্মত রূপ ভাস্কর্যের গুণ বিচারে বা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে চেয়েছে, আর বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে বিমূর্ত রীতি নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তবে, কাজটি এ দেশের শিল্পরসিক ও বোদ্ধাদের কাছে আজও হামিদের অন্যতম বহিরঙ্গণ ভাস্কর্যের উদাহরণ

হিসেবে সমাদৃত। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই কাজটি দেশের বাইরে হামিদুজ্জামানের যোগাযোগ ও পরিচিতির প্রাথমিক সূত্র হিসেবে কাজ করে এসেছে বলে জানা যায়[৯]। এর পরের বছর তিনি তাঁর প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কমিশন ভাস্কর্য *হামলা* (১৯৮১–১৯৮২, ব্রোঞ্জ, ২৯০x২৮০x৭০ সে.মি.) (চিত্র ৯) গড়ার কমিশন পান। *হামলা* ভাস্কর্যটি দীর্ঘ স্তম্ভের উপর এক পায়ে ভারসাম্য রেখে স্থাপিত একটি মানবাবয়ব, অবয়ব গড়েছেন বাস্তবসম্মতভাবে। বন্দুক উঁচু করে লাফ দেয়ার ভঙ্গিমায় সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা, যিনি শত্রুদের মোকাবেলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন– এমন বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাস্কর্যটি সামরিক বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় সিলেট সেনানিবাসের জন্য গড়া। এখানে মুক্তিযুদ্ধে সৈনিকদের অংশগ্রহণকে তুলে ধরার জন্য সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা বিষয় হয়ে উঠেছে। হামিদের প্রথম এই দুটি কমিশন কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি প্রবণতাকে তুলে ধরেছে। একটি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মনুমেন্ট গড়ার চাহিদা থেকে ভাস্কর্য বিষয়ে যে রুচি তৈরি হয়েছে তার প্রতিনিধিত্ব করে (মানবাবয়ব প্রধান, বাস্তবসম্মত রূপ, দৃঢ়তা বা গতিশীল ভঙ্গিমার প্রকাশ– যা আকারে বৃহৎ এবং উঁচু বেদিতে স্থাপিত)। অন্যটি, বিমূর্ত রীতির প্রতি শিল্পীর পক্ষপাতকে নির্দিষ্ট করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাস্কর্যবিষয়ক চাহিদাকে হামিদ কখনও উপেক্ষা করেননি। তিনি এ দেশের মানুষের ভাস্কর্য সম্পর্কিত বোঝাপড়ার সাথে এক ধরনের সম্পর্ক রেখে অগ্রসর হতে চেয়েছেন এবং নিজের বিমূর্ত শিল্পের প্রতি আগ্রহ বা তাঁর আধুনিক ভাস্কর্যসম্পর্কিত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আপোসপূর্ণ মীমাংসার পথও তিনি বেছে নিয়েছেন (লেখকের সাথে শিল্পীর কথোপকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)। এমন অবস্থায় তাঁর কাজ কখনো নিছক অলংকরণের বৈশিষ্ট্যকে যেমন ধারণ করেছে (যেমন, ফার্মগেটে নির্মিত *মাছ*), তেমনি কখনো তাঁর বাস্তবসম্মত অবয়বধর্মী কাজ মানসম্মত হয়ে উঠেনি (যেমন, ঢাকা ক্যানটনমেন্টের *বিজয় কেতন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে স্থাপিত রোকেয়ার প্রতিকৃতি)। তবে, তিনি প্রতিনিয়ত নিজ ভাস্কর্য ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর বা প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ ও পথ উন্মুক্ত করার প্রয়াস করে গেছেন। এ কারণে তাঁর ভাস্কর্য চর্চায় অবয়বধর্মী, বিমূর্ত অবয়ব ও নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপ পাশাপাশি অবস্থান করেছে।

প্রাথমিকভাবে *পাখি পরিবার* ও *হামলা* কাজ দুটির সফলতা তাঁকে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলে তাই নয়; বরং তাঁর কমিশন কাজের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়, তা ভীষণভাবে তাঁকে উজ্জীবিত করে এবং ভাস্কর্য বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি উৎসুক হয়ে ওঠেন। নজরুল ইসলাম মন্তব্য করেন, 'Hamid has an adventurous bend of mind and is willing to take risk in order to pursue his ultimate goal, which is in excelling in the sculptural profession,' (Nazrul, 2005, p. 9)। এই পর্যায়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পচর্চা সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৮২ সালে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী করার (ঢাকায়, বর্তমান চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে। প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যসহ

প্যাস্টেল ও জলরংয়ে আঁকা চিত্র প্রদর্শিত হয়) পর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। একমাস থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ম্যানহাটানে বসবাস করেন; কিছুদিনের মধ্যে নিউ ইয়র্কের একটি স্কাল্পচার স্টুডিওতে তাঁর কাজ করার সুযোগ হয় এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি একক ভাস্কর্য প্রদশর্নী করেন (শাওন, ২০১৮, পৃ. ১৪২)। ১৯৮৩ সালের এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া *একাত্তরের স্মরণে* সিরিজের কিছু কাজ ও নিউ ইয়র্কের স্টুডিওতে করা কিছু কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল (লেখকের সাথে শিল্পীর কথোপকথন, ৮ জুলাই, ২০১৯)। এই সময় হামিদুজ্জামান ওয়াশিংটন ডিসির ইন্টারন্যাশনাল স্কাল্পচার সেন্টারের সদস্য পদ লাভ করেন (Nazrul, 2005, p. 9)।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর কাজে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এমনটি বলা যাবে না। নিউ ইয়র্ক স্টুডিওতে তিনি মোমে মডেলিং করে (বরোদার মতো) ছোট আকারের ঢালাই ভাস্কর্য গড়েন; মূলত তিনি ঢালাইয়ের অগ্রগামী কৌশলকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন (শিল্পীর সাথে লেখকের কথোপকথন, ৮ জুলাই, ২০১৯)। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পরও পুরো আশির দশক তাঁর কাজে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। নিরীক্ষায় প্রধানত উপকরণের গুণাগুণ ধরে অবয়বকেন্দ্রিক বিমূর্ত রচনা প্রাধান্য পায়। বিষয় হিসেবে মুখাবয়ব (১৯৮৭, *প্রতিকৃতি-১*, ২, ৩) (চিত্র ১০) থেকে শুরু করে সাইকেল আরোহী (১৯৮৬, *সাইকেল*) (চিত্র ১১), অস্ত্রোপচারের দৃশ্য (১৯৮৭, *অস্ত্রোপচার*), মুক্তিযোদ্ধার বাস্তবসম্মত দেহাবয়ব (১৯৮৪, *মুক্তিযোদ্ধা-১*); আবার স্ক্রাপ মেটাল দিয়ে অ্যাসেমব্লেজ করে সম্পূর্ণ বিমূর্ত রূপের (যেমন: *ক্যাকটাস*, ১৯৮৯, চিত্র ৭) পাশাপাশি অস্থায়ী স্থাপনাধর্মী ভাস্কর্য তিনি নির্মাণ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তাঁর বর্ণনামূলক স্থাপনাধর্মী কাজগুলি জাতীয় পর্যায়ে শিল্পবোদ্ধাদের মাধ্যমে প্রশংসিত হচ্ছে। তিনি ১৯৮৬ সালে *উড়ির চরে* কাজের জন্য অষ্টম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত) পুরস্কৃত হন এবং ১৯৮৭ সালে *একাত্তরের স্মরণে* স্থাপনাধর্মী কাজের জন্য তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত বিজয় দিবস চারুকলা প্রদর্শনীতে 'শ্রেষ্ঠ শিল্পী'র সম্মান পান। তাছাড়া আশির দশকে *হামলা* ছাড়াও তিনি পরপর আরও তিনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কমিশন ভাস্কর্য গড়েন (১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমির *মুক্তিযোদ্ধা*, ব্রোঞ্জ; ১৯৮৮ সালে ভৈরব জিয়া সার কারখানায় হাতের অবয়ব নিয়ে করা *প্রত্যাশা*, সিমেন্ট ঢালাই এবং ১৯৮৮–৮৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ব্রোঞ্জ ঝালাই ভাস্কর্য *সংশপ্তক* গড়েন, উদ্বোধন হয় ২৬শে মার্চ, ১৯৯০) (চিত্র ১৫)। মোটামুটিভাবে, পুরো আশির দশক বিষয় মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কমিশন ভাস্কর্য হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্য চর্চাকে পরিচালিত করে। এ ভাস্কর্যগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– অবয়বকেন্দ্রিক, বর্ণনাধর্মী, অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাশ; আর এমন বিষয়, যার সাথে দর্শক সহজেই

সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। এই সকল কাজের ভেতর দিয়ে হামিদুজ্জামান জাতীয় পর্যায়ে একজন ভাস্কর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আশির দশক থেকে দেশের বাইরেও ভাস্কর হিসেবে তাঁর বিচরণ ও পরিচিতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। ১৯৮৮ সালে কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সিউলে স্থায়ী ভাস্কর্য উদ্যানে অংশগ্রহণের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। তামার পাত ঝালাইকৃত *সিঁড়ি* নামের ভাস্কর্যটি এই উদ্যানে প্রদর্শিত (স্থায়ী স্থাপন) হয় (চিত্র ১২)। ঊর্ধ্বমুখী সরল গড়ন, রেখার সমন্বয়ে রচিত। রচনায় ঋণাত্মক স্পেসের ব্যবহার গুরুত্ব পায়। রচনার ঢং তাঁর পূর্বের কাজের চিন্তা থেকে দূরবর্তী নয়। মই থেকে অনুপ্রাণিত এই *সিঁড়ি* কাজটি তাঁর অবয়বকেন্দ্রিক বিমূর্ত রীতিকে মূলত প্রতিনিধিত্ব করে। তবে, নব্বইয়ের দশকে তাঁর ভাস্কর্য সংক্রান্ত চিন্তায় যে নতুন সংযোজন ঘটে, তার একটি প্রধান কারণ তাঁর কোরিয়ার সিউলের ভাস্কর্য উদ্যানের অভিজ্ঞতা। তাঁর এই আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তাঁকে একদিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্পী হিসেবে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তোলে; অন্যদিকে, উদ্যানকে কেন্দ্র করে ভাস্কর্য চর্চার সম্ভাবনার দিকটি তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়। ভাস্কর্য উদ্যানের ধারণা তাঁকে প্রকৃতি বা ভূমির সাথে ভাস্কর্যের সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন করে তোলে। ভাস্কর্য নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বিমূর্ত রূপ নিয়ে নতুনভাবে নিরীক্ষা শুরু করেন। তাঁর এই পর্যায়ের কাজে যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ-উত্তর সময়ে সংগঠন পদ্ধতিতে যে সকল নির্বস্তুক বিমূর্ত ধারার ভাস্কর্যের উদাহরণ (অ্যালেক্সানডার ক্যালডার, ডেভিড স্মিথ, অ্যান্তনি কারো, টনি স্মিথ-এর কাজের উল্লেখ করা যায়) পরিলক্ষিত হয় তার একটি সার্বিক অনুরণনকে অনুধাবন করা যায়। বিশেষ করে এই পর্যায়ে ধাতুর পাত কেটে ঝালাই প্রক্রিয়ায় তিনি আরও বেশি প্রত্যয়ী হন, প্রকৃতিতে নাই এমন জ্যামিতিক বিমূর্ত রূপ তাঁর আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে এবং প্রকৃতি ও ভাস্কর্যের রূপ পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এমন উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহার তাঁর ভাস্কর্যে দেখা দেয়। তিনি তাঁর এই বিমূর্ত রূপ সম্পর্কে বলেন–

> We are plainland people and the landscape around us consists of flat green plains stretching as far as the eye can see. As such I try to create some tension (?) movement in the forms I construct. This I do in two ways. First, since I see a cyclical rhythm in nature, in which circular shapes blend into the background, I try to create a tension by using angular geometric shapes especially the triangular ones, so that the sharp edges stand up well against the backdrop. Second, I try to bring about contrast with colour. I colour my paintings and sculpture in startling red, yellow, and

blue, which stand out in the background of our evergreen land.' (Hamiduzzam, 1994, not paginated)

বোঝা যায়, এ দেশের সমতল ভূমির প্রেক্ষাপটে প্রকৃতির সাথে গড়নের সম্পর্ক এবং অবস্থানগত বিবেচনা থেকে তিনি এই কাজগুলো করা শুরু করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তাঁর উদ্যান-ভাস্কর্যবিষয়ক ভাবনা তাঁর জ্যামিতিক বিমূর্ত রূপের প্রতি যে আগ্রহ ছিল তাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে; তা প্রকাশের এবং প্রতিষ্ঠিত করার পথ তিনি তৈরি করে নিতে চান। আর এই পর্যায়ে এসে তিনি তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বস্তুক বিমূর্ত ভাস্কর্যের অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করেন। তাছাড়া, এই পর্যায়ে নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপে আস্থা প্রগাঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যান ভাস্কর্যের ভাবনা ছাড়াও ইতোমধ্যে তাঁর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে (আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত) আরও একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। স্থাপত্যকলার সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ তাঁকে নির্বস্তুক বিমূর্তায়নে আরও বেশি বিশ্বাসী করে তোলে। পাশাপাশি স্থাপত্যকেন্দ্রিক ভাস্কর্য নির্মাণ বিষয়ে তাঁর ভাবনার সূত্রপাত ঘটায় এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে তিনি উৎসাহ বোধ করেন।

কৌণিক, তীর্যক, জ্যামিতিক রূপ, সমতল তল ও রং তাঁর নির্বস্তুক বিমূর্ত ভাস্কর্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। কাজের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন ধাতুর পাত। ধাতু ঝালাই প্রক্রিয়ায় তিনি আগে থেকেই কাজ করে আসছেন। এই সকল কাজের পরিকল্পনা করার সময় তিনি ধাতুর পাতের বিকল্প হিসেবে কাগজকে বেছে নেন। এ ক্ষেত্রে স্থপতিদের মডেল তৈরির প্রক্রিয়া তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। কাগজ কেটে তিনি ম্যাকেট তৈরি করেন। তাঁর কাজে ম্যাকেট তৈরির প্রক্রিয়া যেমন: কাগজ কাটা, ছেড়া, ভাঁজ করার প্রতিফলন দেখা যায়। কোনো কোনো কাজে অরিগামি[১০] রীতির বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে (চিত্র ১৩, ১৪)। কখনো কখনো অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল রূপের প্রকাশ ঘটে। এই পর্যায়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, অভিব্যক্তিপূর্ণ বর্ণনাধর্মী প্রকাশভঙ্গির চেয়ে স্পেস এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপ তাঁর নিরীক্ষায় মুখ্য হয়ে ওঠে। ১৯৮৮ সালের অলিম্পিক ভাস্কর্য উদ্যানের সূত্র ধরে কোরিয়ার সাথে তাঁর একটি চলমান যোগাযোগ তৈরি হয়। সিউল ছাড়াও কোরিয়ার আরও তিনটি স্থায়ী ভাস্কর্য উদ্যানে তাঁর এই ধারার ভাস্কর্য স্থান করে নেয় (Kudrac Sculpture Park, Puyo, 1995; Sancheong Sculpture Park, 1997; Jik Ji Sculpture Park, Kimcheon City, 2004)।

পাশাপাশি, এ দেশে যখন উদ্যানভিত্তিক ভাস্কর্য চর্চা অনুপস্থিত, ভাস্কর্য উদ্যানের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত; তখন তিনি দেশে তাঁর এই বিমূর্ত ভাস্কর্যের সম্ভাবনা নিয়ে নানাভাবে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমাবস্থায়, শুধু প্রদর্শনী করে নয়; বিভিন্ন স্থানের সবুজ চত্বরে নিজ উদ্যোগে এই ধারার ভাস্কর্যগুলি (ধাতু ঝালাই, রঙ করা বিমূর্ত রূপ) স্থাপন করে তিনি স্থায়ী প্রদর্শনের

ব্যবস্থা করেন। এভাবে সাধারণ দর্শককে উদ্যান ভাস্কর্যের ধারণার সাথে পরিচয়ের পাশাপাশি নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপ দেখায় অভ্যস্ত করতে চান। এই পর্যায়ে হামিদুজ্জামান এ দেশের একজন প্রধান ভাস্কর হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন; পৃষ্ঠপোষকদের বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছেন এবং নিজের মতামত জানানোর মতো একটা জায়গা তিনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৯২ সালে লা গ্যালারিতে (ঢাকা) তাঁর এই ধারার ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে (ইতঃপূর্বে ১৯৯১ সালে লা গ্যালারিতে এই ধারার ভাস্কর্য নিয়ে আরও একটি প্রদর্শনী করেন) তিনি গ্যালারির মেঝেতে শুকনা পাতা বিছিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে উদ্যান ভাস্কর্য নিয়ে দর্শকদের ভাবার সুযোগ করে দেন (Fayza, 1994, p.19)। এই সময়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন, 'In Bangladesh today there is still not the mentality of accepting garden sculpture. I would like my pieces to have been 30 feet by one inch sheet; but I need sponsors for that, which I do not have,' (Fayza, 1994, p.19)। তিনি আরও মনে করেন, শুধু উদ্যানে নয়; বিশাল প্লাজার ভেতরে, অট্টালিকায় এরকম ধাতু ভাস্কর্যের সংযুক্তি পরিবেশে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারে (Fayza, 1994, p.19)। উল্লেখ্য যে, নব্বইয়ের দশক নাগাদ ঢাকা শহরে অট্টালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। বসতবাড়ির ধারণায় পরিবর্তন এসেছে এবং অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে অনেক ব্যবসায়ী ভবন নির্মাণ শুরু করেছে। বসতবাড়ি হিসেবে বহুতল ভবন নির্মাণে ডেভেলপারের (বিল্ডার্স/প্রমোটর) ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য পূর্ব থেকেই পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়ন ও প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। ফলে স্থপতিরা তাঁদের পেশাদারিত্বের জায়গাটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন; অবশ্যপূরণীয় শর্তের সাথে নান্দনিক বিবেচনাকে গুরুত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষ করে স্থপতিরা উচ্চবিত্তদের বসতবাড়ি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়ী ভবন ও কর্পোরেট ভবন নির্মাণে নান্দনিক মাত্রা যুক্ত করার ক্ষেত্রে ভাস্কর্য স্থাপনের জন্য ডেভেলপার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের আগ্রহ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছেন (লেখকের স্থপতি নাহাস খলিলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৮ জুন, ২০১৯)। এই প্রক্রিয়ায় নতুনভাবে স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে এ দেশে ভাস্কর্য পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার আরেকটি পথ উন্মুক্ত হয়েছে। সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট হাউজ থেকে ভাস্কর্য পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া শুরু করেছে। তারই ফলাফল স্বরূপ একুশ শতকে এসে হামিদুজ্জামান তাঁর স্থাপত্য সংলগ্ন ভাস্কর্য গড়ার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পান। এ দেশে স্থপতিরা হলেন তাঁর বিমূর্ত রূপের প্রথম সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। স্থপতিদের এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে হামিদুজ্জামান তাঁর বিমূর্ত ভাস্কর্য রূপ উপস্থাপনের পথ করে নেন।

এই পর্যায়ে এসে হামিদের বিমূর্ত চিন্তা নানাভাবে অগ্রসর হয়েছে। শিল্প গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষকদের পরিধি প্রসারিত হয়েছে; সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে স্থপতি, কর্পোরেট ব্যক্তিবৃন্দের শিল্পরুচি ও চাহিদা; কখনো কখনো প্রতিষ্ঠান বা বৃহত্তর

জনগোষ্ঠীর চেয়ে ব্যক্তি রুচি গুরুত্ব পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নিজের শিল্প ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। গণপ্রাঙ্গণ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য ছাড়াও স্থাপত্যের ভেতরে, বাইরে, স্থাপত্য সংলগ্ন চত্বরে, উদ্যানে তিনি ভাস্কর্য স্থাপন করেছেন। ভাস্কর্য উদ্যানের ধারণা থেকে উন্মুক্ত স্থানে ও বাগানে ভাস্কর্য প্রদর্শনী করেছেন (2006, Homage to Matter: A Garden Exhibition, British Council, Dhaka ও ২০১৬, জীবন অন্বেষণ: উন্মুক্ত ভাস্কর্য প্রদর্শনী, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ, আগারগাঁও, ঢাকা)। প্রায় তিরিশ বছরেরও বেশি সময় পর তাঁর ভাস্কর্য উদ্যানের স্বপ্ন সফল হয়েছে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি বাংলাদেশের কর্পোরেট হাউস সামিট গ্রুপের অর্থায়নে তাঁর নিজের ভাস্কর্য উদ্যান গড়ে তুলেছেন। আবার বহিরঙ্গণে বৃহদাকার ভাস্কর্য স্থাপনের পাশাপাশি তিনি অভ্যন্তরে প্রদর্শনের জন্য ছোট আকারের ভাস্কর্য রচনা করেছেন; যেখানে বিষয়গত ভাবনার চেয়ে বিশুদ্ধ সরল রূপ ও উপকরণের গুণ প্রকাশ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে (২০০২, একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী, বেঙ্গল গ্যালারি, ঢাকা)। ধাতু ঝালাই ও ঢালাইয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে পাথর তক্ষণ ভাস্কর্য। পাথরের চরিত্র ও তক্ষণের প্রক্রিয়াকে ধারণ করে বিমূর্ত সরল রূপ এই ভাস্কর্যগুলির প্রধান গুণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয় (Exhibition STONES- 2, Galleri Kaya, Dhaka 2015)।

তিনি স্থাপত্যকেন্দ্রিক কমিশন কাজ পাওয়া শুরু করেন ২০০২ সাল থেকে। প্রথম ইউটিসি ভবনের (পান্থপথ, ঢাকা) প্রবেশ পথের দেয়ালে নির্মাণ করেন *মুক্তিযোদ্ধা*; এটি *সংশপ্তক* ভাস্কর্যের আরেকটি সংস্করণ (চিত্র ১৬)। মানবাবয়বের সরল রূপ; আকারে বিশাল, স্টেইনলেস স্টিলের পাইপ জোড়া দিয়ে করা, ৫০ x ৫৩ ফুট কালো গ্রানাইট পাথরের দেয়ালে লাগান ৩০ ফুট উঁচু এই ভাস্কর্যটি। একই উপকরণ ও প্রক্রিয়ায় ২০০৩ সালে ইউনাইটেড ভবনের (ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান) অভ্যন্তরের দেয়ালে সংযুক্ত করেন উড়ে যাওয়া পাখির দল (পাঁচটি পাখি, ঐক্যের প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করেন। ইউনাইটেড কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ধারণা থেকে করা)। পাখির গড়ন জ্যামিতিক, সরল রেখায় আঁকা রূপের অনুরূপ, যে রূপের সাথে সবাই পরিচিত। আবার ভবনের বাইরের দেয়ালে স্থাপন করেন পাখির সম্পূর্ণ বিমূর্ত রূপ (রং করা, ধাতুর পাতে গড়া), পাখির সাথে এই রূপের সদৃশকরণ সহজ নয়। ২০০৪ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ঢাকা অফিসের জন্য গড়েন একটি ঝুলন্ত ভাস্কর্য; এর রূপ লতার অনুরূপ (চিত্র ১৮)। ১৮ মিটার লম্বা তিনটি আঁকাবাঁকা লতার মতো রূপ (স্টেইনলেস স্টিলের চিকন পাইপে জুড়ে দেয়া হয়েছে পাতলা তামা ও পিতলের পাতে নির্মিত অনেকটা তেতুল গাছের পাতার মতো উপবৃত্তাকার গড়ন) ভবনের মাঝের শূন্য স্পেসে ছাদ থেকে ঝুলে আছে। অনুরূপ বিমূর্তায়ন দেখা যায় ইউনাইটেড হাসপাতাল ভবনের অভ্যন্তরের খোলা অংশে (লাউঞ্জে, ২০০৬); ছাদ থেকে সোজাভাবে নিচে নেমে এসেছে স্টেইনলেসের পাতলা পাইপ, তার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে ফাইবার গ্লাসের পাতলা পাতে তৈরি অনেকটা পাতার মতো (স্বচ্ছ সাদা ও নীল রঙের) কিংবা পাখির গড়নের মত ডিম্বাকৃতি (উপবৃত্তাকার) রূপ; যা দেখতে কখনো ঝরে পড়া পাতার মতো আবার কখনো-

বা সমবেত পাখির দল বলে মনে হয় (চিত্র ১৯)। আপাতদৃষ্টিতে কাজগুলি নির্বস্তুক বিমূর্তায়নের প্রতিনিধিত্ব করে বটে; কিন্তু এই বিমূর্তায়ন প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক রূপের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায়; দৃশ্য জগতের অভিজ্ঞতার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করে। আবার তাঁর ধাতুর পাতে নির্মিত নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপ যুক্ত হতে দেখা যায় স্থাপত্যের দেয়ালে, ছাদে, স্থাপত্যের অভ্যন্তরে ফোয়ারার অংশ হয়ে পানির নিচে (২০০৬, সামিট সেন্টার); স্থাপত্য সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে (নভো থিয়েটার, ঢাকা), বিভিন্ন ভবনের সবুজ চত্বরে। লক্ষণীয় হলো, এখনও যখন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কমিশন কাজে তাঁকে প্রায়শই অবয়বের কাছে ফিরে যেতে হয় (উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা ক্যানটনমেন্টের *বিজয় কেতন*, ২০০১; ময়মনসিংহ ক্যানটনমেন্টে *বিজয়গাথা*, ২০০৪; পটুয়াখালি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে *জয়বাংলা*, ২০১৬), এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তিনি সম্পূর্ণ বিমূর্ত রীতিতে ভাস্কর্য নির্মাণে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন সংলগ্ন চত্বরে নির্মাণ করেন *স্মৃতির মিনার* (২০০৪, রং করা স্টিল পাত), দেল ভিস্তা ভবনের (গুলশান, ঢাকা) বাগানে সংশপ্তকের গতিময়, তীর্যক ভারসাম্যকে কেন্দ্র করে পুনরায় সংশপ্তকের আরেকটি সংস্করণ গড়েন, *মুক্তিযোদ্ধা* (২০০৭, স্টেইনলেস স্টিল) (চিত্র ১৭)। একটি লম্বা পিরামিড আকৃতি, উপরের ভাগ খণ্ডিত হয়ে তীর্যক ভারসাম্যে অবস্থান করছে; এখানে গতিময় তীর্যক জ্যামিতিক রূপ বীরত্বের প্রতীক হয়ে মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে মুক্তিযোদ্ধার 'বীর' বিশেষণটি রূপ লাভ করেছে। একইরকমভাবে 'মুক্তি' সম্পর্কিত উপলব্ধি রূপ ধারণ করেছে তাঁর *ফ্রিডম* নামের ভাস্কর্যটিতে। ২০১৫ সালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট (খামারবাড়ি, ঢাকা) প্রাঙ্গণে কালো লোহার পাইপ জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বিমূর্ত রূপে তিনি ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত। ভাস্কর্যটি স্পেস ও স্থাপত্যের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ভাস্কর্যটির সরল ও অর্ধ বৃত্তাকার রেখার স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় একটি ছন্দ তৈরি করে, যা মুক্তির অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটায়। এর সাথে কোনো চেনা রূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর অনেক রচনায় যুক্ত হতে দেখা যায় অবয়ব থেকে উৎসারিত রূপ; পাখি ঘুরে ফিরে জায়গা করে নিয়েছে; হাত, মাছ, লতা, পাতা এমন সব অবয়বের জ্যামিতিক সরল রূপের প্রকাশ ঘটেছে। এই পর্যায়ে এসে তাঁর অনেক কাজে নিজের কাজের রীতিনীতি ও বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই সকল কাজকে শিল্প সমালোচক ওসমান জামাল self-referential কাজ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন (Osman, 2018, p. 36)। কাজগুলি তাঁর নিজের কাজের উদাহরণ থেকেই উৎসারিত; নিজের কাজের পুনর্নির্মাণও বলা যায় (যেমন: *শান্তি*, স্টেইনলেস স্টিল, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; *শান্তি*, বারিধারা, ঢাকা; *শান্তি*, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম; *উড়ন্ত পাখি*, ইউনাইটেড হাউজ, গুলশান ঢাকা; *ব্রোঞ্জ*, গ্রামীণ ফোন সেন্টার, ঢাকা; মুক্তি, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট খামারবাড়ি, ঢাকা; *স্টিল*, বারিধারা, ঢাকা)। তাঁর এই উদ্যান ও স্থাপত্য সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য নির্মাণ শেষ পর্যন্ত শুধু যে তাঁর বিমূর্ত শিল্প ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন নয়, বরং তাঁর বিমূর্ত রূপ নতুন বৈশিষ্ট্যে উপনীত হয়েছে, নিজ পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব চলার পথ নির্ণয় করে নিয়েছে।

সার্বিকভাবে যা পাওয়া যায় তা হলো, হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্য সংক্রান্ত চিন্তায় দুটি বিষয় সব সময় সক্রিয় থেকেছে– এক, ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গ। ভাস্কর্য এমন একটি শিল্প মাধ্যম, যা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ষাটের দশকে হামিদুজ্জামানের পশ্চিমের গণপ্রাঙ্গণ ভাস্কর্য দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তায় এমন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এটি ছিল তাঁর ভাস্কর হয়ে ওঠার অন্যতম একটি প্রেরণা। তাছাড়া একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে গণপ্রাঙ্গণে ভাস্কর্য স্থাপনের সম্ভাবনাকে তিনি দেখতে পান; উজ্জীবিত বোধ করেন। এক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন ছাড়াও, এ দেশে ভাস্কর হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য বা টিকে থাকতে গেলে কমিশন কাজের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ফলে পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা বা বলা যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রুচির বিবেচনা তাঁর ভাস্কর্যসংক্রান্ত চিন্তায় গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। দুই, বিমূর্ত শিল্প রীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ। পশ্চিমের আধুনিক ভাস্কর্যের অভিজ্ঞতা তাঁর ভাস্কর্য চর্চার মূল অনুপ্রেরণা। আর বিমূর্তায়ন আধুনিকতার পরিচায়ক এমন বিশ্বাস তাঁর অন্তর্গত ছিল এবং বিমূর্ত শিল্পের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিল্পভাষার অনুসন্ধানও সমভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। একদিকে স্মারক ভাস্কর্য হিসেবে বা গণপ্রাঙ্গণে অবয়বধর্মী ভাস্কর্যের চাহিদা, অন্যদিকে নিজের বিমূর্ত রূপে আকর্ষণ তাঁর চিন্তায় সংঘাত সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষেত্রে কখনো তিনি আপোসের পথ বেছে নিয়েছেন, কখনো নিজের শিল্প চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নিজ বাস্তবতায় বা পরিপ্রেক্ষিতে বিমূর্ত শিল্প ধারণাকে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাস্কর্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিমূর্ত শিল্প ধারণাটি অনেক বড় পরিসরে বিচরণ করেছে। প্রাথমিকভাবে আধুনিক শিল্পের পরিচায়ক হিসেবে বিমূর্ত রীতি অ্যাকাডেমিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে যাওয়ার পথ; যেখানে অবয়বকেন্দ্রিক অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি থেকে শুরু করে অবয়বের সংক্ষিপ্ত সরল রূপ বা অবয়বের জ্যামিতিক গড়ন বিমূর্ত রীতির যেমন একটি ধরন তেমনি নির্বস্তুক বিমূর্ত রীতি বিমূর্ত শিল্পের একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁর কাজের তিনটি ধরন দেখা যায়– অবয়বধর্মী (Figurative), অবয়বকেন্দ্রিক বিমূর্ত (Abstracted figure), নির্বস্তুক বিমূর্ত (pure Abstract)। বৈশিষ্ট্যের ধরনগুলিকে সময় অনুসারে ভাগ করা যায় না। এই তিন ধরনের কাজ তিনি পাশাপাশি করে গেছেন। দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (narrative), অবয়বধর্মী ও অবয়বকেন্দ্রিক বিমূর্ত ভাস্কর্যগুলি তিনি গড়েছেন গণপ্রাঙ্গণে; আর তাঁর নির্বস্তুক বিমূর্ত ও স্ব-নির্দেশিত (self-referential) রূপসমূহ জায়গা করে নিয়েছে উদ্যানে, বিভিন্ন ধরনের ভবনের ভেতরে ও বাইরে। তাঁর ভাস্কর্য চর্চার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, বর্ণনামূলক ও অবয়বকেন্দ্রিক রূপ এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে যতটা সমাদৃত হয়েছে, নির্বস্তুক বিমূর্ত রূপ ততটা নয়। উল্লেখ্য যে, হামিদুজ্জামানের নির্বস্তুক বিমূর্ত ভাস্কর্য রূপ জাতীয় পর্যায়ের প্রদর্শনীতে কখনো পুরস্কৃত হয়নি। তবে বুদ্ধিবৃত্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে স্থপতিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে এসেছে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় হামিদুজ্জামানের নির্বস্তুক বিমূর্ত

ভাস্কর্য রচনার শুরুর দিকে এ দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিল্প সমালোচক ফাইজা হক উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'Hamiduzzaman... proved to the world that our artists are outgoing, modern, and not inhibited or encumbered by their Third World environment.' (Fayza, 1994, p.19) কিন্তু শেষ পর্যন্ত হামিদুজ্জামান তাঁর নিজ পরিধিকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি বা চাননি। বরং স্পষ্টতই বলা যায় যে, হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্য চিন্তা এ দেশের মানুষের নানা স্তরের শিল্পরুচি ও চাহিদার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে একটা নিজস্ব চলার পথ নির্ণয় করে নিয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাস্কর্য নিজ বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

অন্ত্য-টীকা

১. ঢাকার চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। এখানে ভাস্কর্য বিভাগ খোলা হয় ১৯৬৩ সালে। এই সময় থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চিত্রকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আবদুর রাজ্জাক, আনোয়ার জাহান, আনোয়ারুল হক, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং স্বশিক্ষিত ভাস্কর কাজি মতিউর রহমান ঢাকায় নিয়তিম ভাস্কর্য চর্চা করেছেন (লেখকের সংগ্রহ করা তথ্য)। এর পূর্বে বাংলাদেশে নভেরার ভাস্কর্য চর্চা দিয়ে এ দেশে আধুনিক ভাস্কর্য চর্চার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ভাস্কর্য চর্চা করেন। এই সময়ে তিনি প্রাঙ্গণ ভাস্কর্যকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং এই বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন। অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গণ ভাস্কর্যের দুটি ভাগ নিয়ে তাঁর চিন্তা ঢাকা পর্বের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় (বিস্তারিত– লালা রুখ, ২০০৭, পৃপৃ.৩৫৫–৩৫৮)। তিনি ১৯৫৮ সালে তেজগাঁওয়ের একজন ধনী ব্যবসায়ী শিল্পপতি এম আর খানের বাড়ির আঙ্গিনায় একটি প্রাঙ্গণ ভাস্কর্য গড়েন (রেজাউল, ২০১৫, পৃ. ৬৭)। এছাড়া এফডিসি ভবন-প্রাঙ্গণসহ আরও কিছু ভবন সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি ভাস্কর্য স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায় (বর্তমানে এর কয়েকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত)। কিন্তু নভেরার বিদেশ চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর ভাস্কর্য সবার দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। তাঁর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ভাস্কর্যচিন্তা বা চর্চার ধারাবাহিকতা তৈরি হয় না। বরং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জন মানুষের আগ্রহে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মনুমেন্ট গড়ার মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য চর্চা স্থাপন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আজও বাংলাদেশের অধিকাংশ কমিশন প্রাঙ্গণ ভাস্কর্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মনুমেন্ট।

২. Monumental: It is intented to convey the idea that a particular work of art, or part of such a work, is grand, noble, elevated in idea, simple

in conception and execution, without any excess of virtuosity, ... It is not a synonym for 'large'. (Peter & Linda, 1987, p. 279).

৩. ধর্মীয় সংস্কারের উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শিল্পকলা বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবহমান ছিল (নিসার, ২০১৬, পৃ. ২০০)। উনিশ শতকের প্রথম দশকে তরিকা-ই মুহম্মদীয়া, ফরায়েজি ও আহলে হাদিস ইত্যাদি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের শুদ্ধ মতবাদ প্রচার করা। এ সকল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুধু যে ইসলামি ধর্মাচরণ পুরোপুরিভাবে মেনে চলার উপর জোর দিয়েছিল এমন নয়; সেই সাথে ইসলাম থেকে স্থানীয় প্রভাব অর্থাৎ হিন্দু প্রভাব দূর করার নির্দেশ দিয়েছিল (রানা, ২০০৭, পৃ. ১৩৩)। এই সকল আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ক্রমশ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাথে এ দেশের পরম্পরা শিল্পের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে– জয়নুল ১৯৩২ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই সালে (১৯৩২-৩৩ শিক্ষাবর্ষে) ১১০ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন ও শফিকুল আমীন শুধু মুসলমান ছিলেন। তাঁদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিলেন আবদুল মঈন ও হাবিবুর রহমান (আজিজুল, ২০১৫, পৃ. ২৩–২৪) এবং তখন পর্যন্ত কলকাতা আর্ট স্কুলে কোনো মুসলিম ভাস্কর্য চর্চা করেছেন এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সে সময়ে বাঙালি মুসলমান যাঁরা শিল্পকলার চর্চা করছিলেন তাঁরা একরকম প্রচলিত সামাজিক শর্ত ও প্রথা ভেঙেই এগিয়ে এসেছিলেন (Lala Rukh,1998, p. 8)। তাছাড়া বাংলাতে যে সকল মুসলিম নবাব শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁরাও বাঙালি ছিলেন না, তাঁরা বহিরাগত মুসলিম; তেমনি আঠারো শতকের শেষে কলকাতায় আগত মুগল সুরতখানার উত্তরসূরি মুসলিম চিত্রকরেরা ছিলেন অবাঙালি, তাঁরা উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় শিল্পের চর্চা করেছেন। এমনকি উনিশ শতকে কলকাতার কালিঘাটে ও বটতলায় কোনো মুসলিম চিত্রকর ছিল না (শোভন, বা. ১৪০২, পৃ. ৯০)।

৪. স্থাপনা শিল্প: একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা প্রায়শই কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জন্য, নানা মাধ্যমের সমন্বয়ে বড় আকারের নির্মাণ। স্থাপনা শিল্পকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো ঘর জুড়ে অথবা প্রদর্শন কক্ষের অংশে স্থাপিত (কখনো প্রাকৃতিক পরিবেশে); পরিকল্পনা অনুসারে দর্শক এর মধ্যে সশরীরে হেঁটে হেঁটে পুরোপুরি যুক্ত হয়ে গভীরভাবে চিন্তায় নিমগ্ন হতে পারেন। আবার কিছু স্থাপনায় দর্শক একে প্রদক্ষিণ করেন এবং কিছু স্থাপনা এতটা নাজুক বা নশ্বর হয় যে দরজার বাইরে বা দূরত্ব রেখে অবস্থান করতে হয়। স্থাপনা শিল্প ভাস্কর্য বা অন্য প্রচলিত শিল্প মাধ্যমের মতো কোনো একক শিল্প কর্ম নয়, বরং এটি একটি সমন্বিত অভিজ্ঞতা। এখানে দর্শক কীভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তার উপর গুরুত্ব

দেয়া হয় এবং স্থাপনা শিল্পের অন্যতম বিষয় হচ্ছে দর্শককে একটি সুতীব্র অভিজ্ঞতা প্রদান করা। (https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/installation-art, accessed 10 June 2021)।

৫. 'Abstract art is art that does not attempt to represent an accurate depiction of a visual reality but instead use shapes, colours, forms and gestural marks to achieve its effect. The term can be applied to art that is based an object, figure or landscape, where forms have been simplified or schematised. It is also applied to art that uses forms, such as geometric shapes or gestural marks, which have no source at all in an external visual reality. Some artists of this 'pure' abstraction have preferred terms such as concrete art or non-objective art, but in practice the word abstract is used across the board and the distinction between the two is not always obvious. Since the early 1900s, abstract art has formed a central stream of modern art.' (https://www.tate.org.uk accessed 16 august 2021)− এই প্রবন্ধে নির্বস্তুক বিমূর্ত পরিভাষাটি non-objective, অর্থাৎ 'pure' abstraction অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. শিল্পগবেষক ও ভাস্কর জনক ঝংকার নার্জারী উল্লেখ করেন, '... the European realistic tradition attempting to depict perfectly 'as we see'..' (1993, p. 46)। এই প্রবন্ধে যা চাক্ষুষভাবে বাস্তবসম্মত এই অর্থে বাস্তবানুগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. তখন ভারতের মধ্যে বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাস্কর্য শেখার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হামিদুজ্জামান বলেন, শিক্ষার পরিবেশ ছিল উদার ও নিরীক্ষাধর্মী। তাঁর শিক্ষক ছিলেন ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী, রাঘব কানারিয়া, মহেন্দ্র পান্ডে। রজণীকান্ত পানচাল ছিলেন তাঁর কোর্স শিক্ষক। তাঁর কাছে তিনি ধাতু ঢালাই, বিশেষ করে ঢালাই পদ্ধতিতে ধাতু ও মোমের গুণাগুণ ব্যবহার শিখেছিলেন। এ সময়ে চিত্রকলার শিক্ষক ছিলেন কে জি সুব্রহ্মণ্যন, যিনি শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু করতে উৎসাহিত করতেন। তাঁর পরামর্শ হামিদুজ্জামানকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল (Kaiser, 2018, p. 81−83; লেখকের সাথে শিল্পীর কথপোকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)।

৮. তিনি ভারতে বরোদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্যে পাঠ গ্রহণ করবেন মনস্থির করেন, বৃত্তি পান ১৯৭৩ সালে। কিন্তু সে বছর (১৯৭৩ সালে) কোনো আসন ফাঁকা না থাকায়

পরের বছর ১৯৭৪ সালে তিনি বরোদায় যান; ১৯৭৬ সালে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন (Kaiser, 2018, p. 82)।

৯. শিল্পীর দেয়া তথ্যানুসারে, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত *পাখি পরিবার* ভাস্কর্য বিষয়ে প্রকাশনাটির (ক্যাটালগের) মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ঘটে; ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাঁর চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে এবং এই সূত্র ধরে ২০০৬ সালে তিনি বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অফিস ভবনের জন্য ভাস্কর্য গড়ার কমিশন পান। একইভাবে ঐ প্রকাশনাটির সূত্র ধরে ১৯৮৮ সালে কোরিয়ায় সিউলে অলিম্পিক কমিটি আয়োজিত স্থায়ী ভাস্কর্য পার্কে ভাস্কর্য স্থাপনের জন্য তিনি আমন্ত্রণ পান (লেখকের সাথে কথোপকথন, ১৬ জুলাই, ২০১৯)।

১০. Origami: 'origami, art of folding objects out of paper to create both two-dimensional and three-dimensional subjects. The word origami (from Japanese *oru* ["to fold"] and *kami* ["paper"]) has become the generic description of this art form, although some European historians feel it places undue weight on the Japanise origins of an art that may well have developed independently around the world.' (https://share.google/BxLiayVjlwcyJjSV5, accessed 22 august 2025)

সহায়কপঞ্জি

আজিজুল হক, সৈয়দ। (২০১৫)। *জয়নুল আবেদিন: সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম। (২০০৩)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর: প্রথম পর্ব ১৯৪৭-৫৬*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

নিসার হোসেন (২০১৬)। 'জয়নুল আবেদিন'। *জয়নুল আবেদিন: জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি* [সম্পা. সৈয়দ আজিজুল হক], বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা। পৃ. ২০০–২১৫।

রানা রাজ্জাক (২০০৭)। 'সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তন: আধুনিক যুগ'। [সম্পা. কে এম মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ]। *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ১২৫–১৪৬।

রেজাউর করিম, সুমন (২০১৫)। 'নভেরা আহমেদের ভাস্কর্যচর্চার স্বল্পালোচিত অধ্যায়: ১৯৬০–৭০'। *নভেরা আহমেদ* [সম্পা. আবুল হাসনাত], বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা। পৃ, ৬৭–৯৬।

লালা রুখ সেলিম (২০০৭)। 'নভেরা আহমেদ'। *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ [সম্পা. লালা রুখ সেলিম]। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃপৃ, ৩৫৫–৩৫৮।

শোভন সোম (বা. ১৪০২), 'জয়নুল আবেদিন'। *নিরন্তর:* সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক পত্রিকা [সম্পা. নাঈম হাসান], চতুর্থ সংখ্যা, বর্ষা সংকলন। পৃ. ৭২–১২০।

Amjad Ali, S (1965). 'Dacca Artists'. *Pakistan Quarterly*. Editor S. Amjad Ali. Vol.xiii. No.2 & 3. Autumn & Winter. Karachi. pg: 96–111.

Fayza Haq. (1994) 'Soaring Spirit With Steel Sheets'. *Word of Creations: Hamiduzzaman* (A book on the works of Hamiduzzaman Khan). (Ed. Mamun Kaiser), Dhaka. p. 19.

Hamiduzzam Khan. (1994). 'My Recent Work'. *Word of Creations: Hamiduzzaman* (A book on the works of Hamiduzzaman Khan). (Ed. Mamun Kaiser), Dhaka. pg: not paginated.

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/installation-art. accessed 10 June 2021

https://www.tate.org.uk. accessed 16 august 2021

https://share.google/BxLiayVjlwcyJjSV5 , accessed 22 august 2025

Janak Jhankar Narzary. (1993). 'Modern Indian Sculpture: A Background Upto 1950'. *Nandan:* an Annual on Art and Aesthetics. vol.xiii. Department of History of Art. Kala Bhavana: Visva-Bharati. Santiniketan. pp: 44–54.

Jogesh Chandra Bagal. (1966). 'History of the Govt. College of Art & Craft'. *Centenary: Government College of Art & Craft Calcutta*. Calcutta. pp. 1–58.

Kaiser Huq. (2018). 'An interview with Hamiduzzaman Khan: Heavy Metal'. *Hamiduzzaman Khan: Modern Sculptor in Asia*. (Ed. Shaikh Mehedi Hasan), Ikrimikri, Dhaka. pp, 79–87.

Lala Rukh Selim. (1998). '50 Years of Fine Art Institute'. *Art*, A quarterly journal, (Ed. Lala Rukh Selim.), Vol.4. No.2. October-December. Dhaka. pp. 6–13.

Nazrul Islam. (2005). 'Hamiduzzaman Khan: A Modern Sculptor', *Hamiduzzaman Khan: A Modern Sculptor* (Ed. & Published by Akhtar Jahan (Ivy)), Dhaka.

Osman Jamal. (2018). 'From the Popular the Reverential'. *Hamiduzzaman Khan: Modern Sculptor in Asia* (Ed. Shaikh Mehedi Hasan), Ikrimikri. Dhaka. pp. 29–37.

Peter and Linda Murray. (1987). *Dictionary of Art & Artists*. Penguin Books. Fifth edition. p. 279.

Shah Alam Zahiruddin. (1981). 'The Bird Family'. Birds By Hamiduzzaman Khan. The Goverment of the people's Republic of Bangladesh. Dhaka. p. 3.

চিত্র-১: *একাত্তরের স্মরণে– ঝুলন্ত মানুষ*, ১৯৭৪, ব্রোঞ্জ

চিত্র-২: *একাত্তরের স্মরণে– দরজা*, ১৯৭৪, ব্রোঞ্জ

চিত্র-৩: *একাত্তরের স্মরণে– রিকশা*, ১৯৭৪-৭৫, ব্রোঞ্জ

চিত্র-৪: *আর নয়*, ১৯৮০
লোহা, কাপড়, প্লাস্টার

চিত্র-৫: *উড়ির চরে*, ১৯৮৬, মিশ্র মাধ্যম

চিত্র-৬: *কম্পোজিশন*, ১৯৭৭, ধাতু ঝালাই

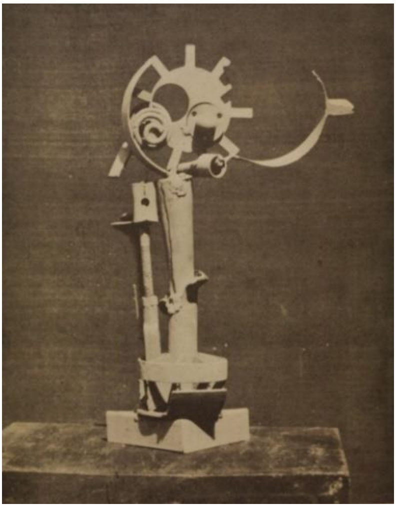

চিত্র-৭: *ক্যাকটাস-১*, ১৯৮৯, লোহা ঝালাই

চিত্র-৮: *পাখি পরিবার*, ১৯৮০, ব্রোঞ্জ পাত ও রড

চিত্র-৯: *হামলা*, ১৯৮২, ব্রোঞ্জ

চিত্র-১০: *প্রতিকৃতি-১*, ১৯৮৭, কাঠ

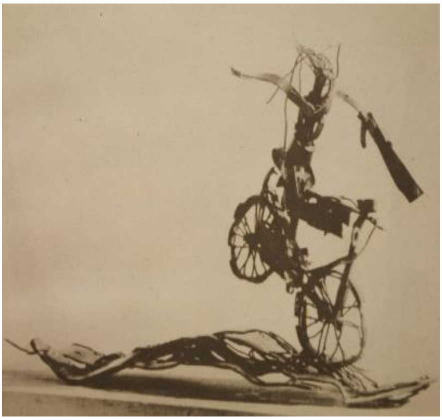

চিত্র-১১: *সাইকেল*, ১৯৮৬, তামা

চিত্র-১২: *সিঁড়ি*, ১৯৮৮, ব্রোঞ্জ,
অলিম্পিক পার্ক, সিউল সাউথ কোরিয়া

চিত্র-১৩: *Spirits of Boat*, ১৯৯২, স্টিল

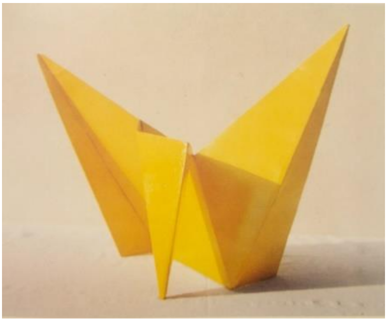

চিত্র-১৪: *Spirits of Triangles*, ১৯৯২, স্টিল

চিত্র-১৫: *সংশপ্তক*, ১৯৮৮-৮৯, ব্রোঞ্জ ঝালাই,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

চিত্র-১৬: *মুক্তিযোদ্ধা*, ২০০২, স্টিল
ইউটিসি ভবন, ঢাকা

চিত্র-১৭: *মুক্তিযোদ্ধা*, ২০০৭, স্টেইনলেস স্টিল, গুলশান, ঢাকা

চিত্র-১৮: *Untitled*, ২০০৪ স্টেইনলেস, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আগারগাঁও, ঢাকা

চিত্র-১৯: *মিশ্র মাধ্যম*, ২০০৬, ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা